আমাদের ডিকেন্স

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

চার্লস ডিকেন্স? আজ কি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক পরীক্ষার অবসন্ন পাঠের বাইরে তাঁকে আমরা স্মরণ করি? ল্যাটিন আমেরিকা বা ইয়োরেপের নানা ঔপন্যাসিক যেভাবে ইংরেজি জানা মধ্যবিত্ত বাঙালীকে প্লাবিত করে, আফ্রিকাও বাদ যায় না, চার্লস ডিকেন্স তো তার কাছে সেকেলে। মেলোড্রামায় ভর্তি। চরিত্রের ভীড়ে ঘটনার গল্পে ভর্তি ডিকেন্স তো তার কাছে সেকেলে। মেলোড্রামায় ভর্তি। চরিত্রের ভীড়ে ঘটনার গল্পে ভর্তি ডিকেন্স সম্পর্কে প্রশংসা করে এমনই বলা হয়: “He was a great comic artist and a great entertainer.” ডিকেন্সের বিপুল জনপ্রিয়তা পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখাও তাঁর জন্যেই পত্রিকার বিক্রম চমকপ্রদভাবে বেড়ে যাওয়া উঁচু কপালে উন্নাসিকদের কাছে তাঁকে ঐ বিনোদক হিসাবেই হাজির করেছে। আজকের উপন্যাস পাঠের ফ্যাশনে ১৮১২ থেকে ১৮৭০ —এই আটান্ন বছরের মানুষটির স্থান কোথায়? ১৮৩৭-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস— তার আগে পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে বেরোয়। আমরা একটা দেখার চেষ্টা করি, আর ডিকেন্স কতটা প্রাসঙ্গিক?

ইংলন্ডে ঐ ১৮৩৬-৩৭ থেকে ১৮৭০ এক পরিবর্তনের সময়। শিল্প বিপ্লব প্রথম পর্যায় অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে। ঐ বিপ্লবের অভিঘাত প্রবল—ফলে সংস্কারের যুগ। যাকে ভিক্টোরীয় যুগ বলা হয় তার ঠিক আগেই ডিকেন্স তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখেন। আর এই সময়ই ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে গ্রেট ব্রিটেন পৃথিবীর দিকে দিকে প্রসারিত। ১৮১২-এ ডিকেন্স যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়ে উঠছে, আর ১৮৩৬ -৩৭-এ পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত, প্যারা-মাউন্টসি কাম ইম্পিরিয়ালিজম। ডিকেন্স বৃটিশ শক্তির এই সফল যুগের মানুষ নব্য সাম্রাজ্যবাদী পর্যায় শুরু হবার মুখেই তিনি প্রয়াত হন। ১৮৩৬ থেকে ১৮৭০, এই সময়ে বৃটেন তাঁর পটভূমি। এই সন্ধিক্ষণের লেখক ডিকেন্স যেন হয়ে ওঠেন এক পৌরাণিক চরিত্র, এক অতিকথার নায়ক। তাই একজন আলোচকের লেখায় পাই তাঁর মৃত্যুর পর একটি ছোট মেয়ে কেঁদে উঠেছিল : “Dickens dead, then will Father Chistmas die too?”

ডিকেন্স ঐ ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের প্রক্রয়ায় যে বাস্তব দেখা দিয়েছিল তার লেখক। তাঁকে পড়তে হয় ঐ সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে, লন্ডনের মানুষ হিসাবে। আর যেহেতু ঐ সময় একমাত্রিক নয়, বিশ্বের অন্যত্র যে শক্তি উপনিবেশের শৃঙ্খল এনেছে আবার নিজে প্রয়োজনেই ভারতের মত দেশে অচেতনভাবেই পার্সল করেছেন যার এক ভূমিকা আবার বৃটেনের অভ্যন্তরে শিল্পের আধুনিকীকরণে সৃষ্টি করেছে অভূতপূর্ব সম্পদ; পুরনো জগৎকে ভেঙে দিচ্ছে, আবার তার পাশেই চূড়ান্ত বৈষম্য, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য এমন এক জীবন যার দারিদ্র-দুর্দশা আগের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই দ্বন্দ্বাত্মক বাস্তবে ডিকেন্স খুঁজেছেন তাঁর মানুষদের। তাঁর প্রথমদিকের নভেলে পুরনো বাস্তব ও ব্যবস্থা সম্পর্কে এক অতীত বিধুর মন আবার অতি উৎসাহিত প্রাণময়তা। আবার কেউ কেউ তাঁর পরের উপনন্যাসগুলিকে বেশি পছন্দ করেন নতুন শিল্প সমাজের বিষণ্ণ ও নিরালোক ছবি আঁকার জন্য। মনে রাখা দরকার ডিকেন্স শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না, রিপোর্টারের স্কেচও তিনি এঁকেছেন। ঐ অভিজ্ঞতাই তাঁকে পাল্টেছিল, যদিও প্রথম দিকের বৈশিষ্ট্য ঐ নিরালোক ছিল। লন্ডন, সেই সময়কার লন্ডন মূর্ত হয়ে ওঠে ডিকেন্সের লেখায়। বলা হয়ে থাকে যে পিকাবেস্ক পদ্ধতি ডিকেন্স প্রারম্ভে গ্রহণ করেন তা তাঁর পঠন থেকে এসেছিল— সেরভান্টেস, স্মলেট, ফিল্ডিং পাঠ থেকে। তাঁর উপনাসের মেলোড্রামার উৎস তো তার সময়ও। ঐ সময়ের লন্ডন তথা ইংলন্ডে যে বাস্তব দেখা দিয়েছে তাতে মানুষের জীবন তো শুধু ড্রামাটিক নয়, মেলোড্রামাটিক। ডিকেন্স তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন একটা কমিক স্পিরিটে এবং তাঁর নিজস্ব রিয়ালিজমে মেলোড্রামা মাত্রই পরিত্যজ্য, এ মতগ্রাহ্য নয়—জীবনে যা আছে উপন্যাসে তা থাকবে না কেন? তবে জীবনের মত শিল্পে তা আসে না— যাঁরা ডিকেন্স-এর লেখায় এটা ত্রুটি হিসাবে দেখেন তাঁরা ধরতে পারেন নি যে বাস্তব সচেতন ডিকেন্স মেলোড্রামাকে কাজে লাগানো তাঁর ঐ সময়ের এক শুদ্ধ লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গীর ছাঁকনিতে। এপিসোডিক হয়ে টুকরোগুলিকে জুড়ে।

ক্রমে ডিকেন্স তাঁর লিবারেল বীক্ষায় ঐ টুকরোগুলিকে এক সামাজিক সমগ্রতায় দেখতে শুরু করেন। ১৮৪০-এর দশকে রাজনৈতিক চঞ্চলতায়, শিল্প বিপ্লবের নিপীড়ন যখন ক্রমশঃ প্রকট জনগণের সামনে, তখন ডিকেন্স তাঁর সময়কার ঔপন্যাসিক হয়ে উঠলেন এক মানবিক উদার নীতিতে। উপন্যাস প্রত্যক্ষভাবে প্রচ্ছন্নে ঐ সময় আসতে লাগল এক সমগ্র বোধে। ডিকেন্সের ঔপন্যাসিক কল্পনায় চার্টিস্ট আন্দোলন, আরও অনেক কিছু এল। একজন আলোচকের ভাষায় : “In railways, spreading their network orom city to city across the tace of England, the movelist found an emblem for innovating spirit যাতে স্টেজ কোচের অলস জগৎ বা পিকউইক পেপারস-এর কান্ট্রি ইনস যেন অপাংক্তেয় হয়ে গেল।

তবে ঐ আলোচক যথার্থই দেখান তাঁর মানুষের প্রতি ভালোবাসা, লিবারেল অনুকম্প, দারিদ্র নিপীড়ন সম্পর্কে মানসিকতা তাঁকে যেন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা, বৈষম্য-পীড়িত শিল্প-বিপ্লবের নির্মম বাস্তবের ক্রিটিক করে তুলেছে তেমনি তাঁর শ্রেণী-বৃত্ত কখনোই হারায়নি। গভীরভাবে দেখলে তিনি সেই সময়কার একটি শ্রেণীর দৃষ্টিকোণকেই বহন করেছেন— মিডল ক্লাস রেসপেক্টেবিলি ডিকেন্সের লেখায়। তবে এর চরিত্র একান্ত ডিকেন্সীয়। ঐ মধ্যশ্রেণীর সমালোচনাও তাঁর মধ্যে তীব্র। অর্থবা মধ্যশ্রেণীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, মধ্যবিত্ত সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের গচ্ছিত স্বার্থকই বড় করে দেখান, কোন সংশোধন নয় অসুস্থ খারাপদের আরও ব্যাপক করা— এসবের দিকেই আঙুল তুলেছেন। এই সিস্টেমের বিরুদ্ধেই তাঁর লেখনী। আর এখন আর কোন ব্যক্তি অত্যাচার নিপীড়নের উৎস নয়, ঐ সিস্টেম। আদালতের বিচারকেরও কোন উত্তর জানা নেই, এটা ভুল না ঠিক। তিনি সেখানে বসে আছে, ঐ সিস্টেমকেই বাঁচাবার জন্য। ১৮৫০ -এর দশকের উপন্যাসে অর্থাৎ ডেভিড কপারফিল্ড (১৯৫০) থেকে এ টেল অব টু সিটিজ (১৮৫৯) পর্যন্ত; যার মধ্যভাগে রয়েছে ব্লিক হাইস, হার্ড টাইমস্, গ্রেট এক্সপেটেশন-এর মত উপন্যাস, “Society in its institutionalised aspect has relaced the individual in all ractors of the carlier novels as the true villiain.” ডিকেন্স পাঠে তাঁর এই হয়ে ওঠা বা বিকামিং আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। শাসক শ্রেণী সম্পর্কে তাঁর ধিক্কার অবশ্য

সাংবাদিক জীবনের দিনগুলি থেকেই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, “I am hourly strengthened in my old belief that our political aristorcracy and our tufthunting are the death of England. In all this Business I don’t see a gleam of hope. জনগণের মন পার্লামেন্ট ও সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন। ব্লিক হাউসে দলীয় উপদলতন্ত্রর ব্যঙ্গ মর্মভেদী। আইন-আদালত, রাজনীতি—সব সম্পর্কেই তিনি শ্রদ্ধা হারিয়ে ছিলেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বহীনতাও ঐ আইনের মতই। নিম্নবর্গের উন্নতিতে শিক্ষার ভূমিকা স্বীকার করেও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন : “the delegated authorities used educational reform as an excuse for regimenting the minds of Pupils indoctrinating them with class prejudice and instution an uncritical accpetance of debased values.” পল ডম্বে ও ডেভিড কপারফিলড পুরনো শিক্ষার বলি, এর পাশাপাশি ডিকেন্স এমন সব “youths” সৃষ্টি করেছেন যারা নষ্ট হলো তথাকথিত প্রগতিশীল শিক্ষায়। আসলে ডিকেন্সর ঔপন্যাসিক সত্তা দুর্বল, পিছিয়ে থাকা মানুষের কথা বলতে চেয়েছে। তিনি একজন জনগণের লেখক : অথচ তাঁর মধ্যেই হয়তো বৌদ্ধিক সংহতি নেই, মনে হতে পারে নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর বিশ্বাস ছিল illimitable. তাঁর সময়কার তত্ত্ব তাঁকে তাড়িত করে নি, সঙ্কীর্ণ doctrinaire অবস্থান তাঁর ছিল না— ছিল একটা র‍্যাডিক্যাল মানবিকতা। এক স্বার্থপর শ্রেণী ও তাদের চালিত সমাজের চিত্র এঁকে দেন ডিকেন্স—অসহায় প্রতিরোধহীন মানুষের স্বরই বেজে যায় অলিভার টুইস্ট-এর স্বরে ‘I will be good indeed, indeed I will Sir! I am a very little boy, Sir, and it is so so- ...So lonely Sir! So very lonely.’ দুর্দশা-নিপীড়ন—দারিদ্রের যে ছবি ডিকেন্স আঁকেন, তাতে ভিক্টোরীয় যুগের বিশ্বব্যাপী প্রসারমান সাম্রাজ্যের লন্ডন ও ইংলন্ডের সমৃদ্ধির অন্ধকারকে দেখায়। তাঁর সময়ে অন্য ঔপন্যাসিকরাও এ ছবি এঁকেছেন, হয়তো আরও তথ্যভিত্তিক ছবি—নানা নৈতিক প্রোগ্রামসহ বাস্তববাদী ছবি— কিন্তু ঔপন্যাসিকের কল্পনার বিস্তারে ঐ নৈঃসঙ্গ্য, অসহ্য lonely হবার কথা ডিকেন্স যেভাবে বলেন, তাঁরা তা পারেন না। ডিকেন্সের উপন্যাসকে তাই কেবল সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বোঝা যায় না, এ এক বড় ঔপন্যাসিকের শিল্পের বাস্তব, চরিত্র-প্লট-গল্প-ভাষা মিলিয়ে এমন বাস্তব যে আজও আমাদের কাছে জীবন্ত—একটি সময়ের প্রাথমিক —যার নতুন অর্থ এখন খুঁজে পায়। ঐ দারিদ্রর কথা বলেন ডিকেন্স, খাদ্য-বস্তু থেকে বঞ্চিতদের কথা, অথচ এটাও জানান মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কেবল শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যে— মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না শত স্টীম-এঞ্জিন, শিল্পের গঠিত প্রদর্শনীও। আর ঐ বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে ধর্মও ব্যর্থ কোন দিকে নির্দেশ দিতে তাঁর কাছে চার্চ ও তার আচার-অনুষ্ঠান আনন্দহীন, অপরের আনন্দকে দমিত করে। অথচ দস্তয়েভস্কি ডিকেন্সকে great christian বলেই অভিহিত করেছেন। ১৮৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে দস্তয়েভস্কি সৃষ্টিশীল সংশ্লেষণ করেন ডিকেন্সের হরিণা গ্রেডিনার ভাষায়, “Spirit and Style”-কে। এ সময় তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে আবার মূল সংস্কৃতি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। ঐ বিচ্ছিন্নতার নৈঃসঙ্গে ডিকেন্স আসেন তাঁর পঠনে, চৈতন্যে। নিজেদের এক সময়ের দরিদ্র অবস্থাকে ঠাট্টা করে নিজেকে দস্তয়েভস্কি বলতে মিঃ মিকবার আর স্ত্রী কেমিসেস মিকবার।

ই. ডি. এইচ. জনসন-এর একটি আলোচনা ধরে বোঝার চেষ্টা করছি ডিকেন্সকে। অবশ্যই জনসন যে প্রেক্ষিত থেকে দেখেছেন, আমাদের প্রেক্ষিত তার থেকে আলাদা। কিন্তু জনসনের ব্যাখ্যা থেকে আমরা আমাদের এই সময়ে, এই বাস্তবে ডিকেন্সের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে পারি। ডিকেন্স সেই সময় ও সেই বাস্তবের লেখক যা আমাদের জীবনকে পরাধীন করেছে, আমাদের ইতিহাসকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দিয়েছে। ঔপন্যাসিক এক অস্তিত্বে আমরা ঢুকেছি। ডিকেন্স ঐ বাস্তবের উৎস যে দেশ তার গল্প-কথক। শেকসপীয়রের মতো এই গল্পকথনে নানা প্রভাবের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আমাদের মধ্যবিত্তর ঔপনিবেশিক উত্থান ও প্রসারে শেক্সপীয়রকে বাদ দিলে ডিকেন্সের উপস্থিতিই প্রধান আর তাঁর সূত্রে এসেছে বাইবেল, রূপকথা, উপকথা আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের পরম্পরা। এসেছিল স্কট-কালাইল। একথা ঠিক, দুই শহরের গল্পে ডিকেন্স ইয়োরোপীয়— কেউ কেউ বলেছেন ডিকেন্স কন্টিনেন্টকে কখনোই বোঝেন নি। লন্ডনই ছিল তাঁর বিশ্বের কেন্দ্র— অথচ দুই শহরের গল্প বললেন— আর একটি শহরের যে বর্ণনা দেন তা লন্ডনের বর্ণনা থেকে কম নয়। বলা হয় A Tale of Two cities পরবর্তী ডিকেন্সের ট্র্যাজিক বিষাদে ছোঁয়া। ফ্রান্স সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত অজ্ঞতা “Went with amazing intative perception of the truth about it. কার্লাইলের প্রভাবে ডিকেন্স ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে উৎসাহিত হন। কিন্তু ডিকেন্সের ইনটুইশন ও ইমাজিনেশন তাঁর লেখায় প্রকৃত ফরাসী বিপ্লবকে, কার্লাইল অপেক্ষা অনক বাস্তব করেছিল। কল্পনা করতে ইচ্ছা হয় ডিকেন্স প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে আরেক শহরের গল্প যদি লিখতেন। তাঁর লন্ডন যে শহরকে ১৮৭০ -এর মধ্য সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর করে তুলেছে—কলকাতা।

আজ ডিকেন্সের লন্ডনের অধীন আমরা নই। ষাট বছরেরও বেশি এক ফর্মাল স্বাধীনতার মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর লন্ডনের ক্ষমতা ও আধিপত্যও আর নেই। অথচ ঐ প্রথম শিল্পবিপ্লবের সময়কার ডিকেন্স আজ এই অব উপনিবেশের নব্য উদারবাদী শ্বেতনাট্যে কত প্রাসঙ্গিক। ডিকেন্স ঐ সময়ের দুটি বিপ্লবকে দেখেছেন— একটির অভ্যন্তরেই তিনি ছিলেন। আর একটি—ফরাসী বিপ্লবের অভিঘাত তাঁর ওপর ছিল। একজন মধ্যশ্রেণীর মানুষ হিসাবে দেখেছিলেন ঐ শ্রেণীর ক্ষমতার অলিন্দে আসা। ঐ ক্ষমতার নির্মম বিশ্লেষণ তিনি করেন। আজ আমরা আমাদের বাস্তবে নানা মতবাদের কাটাকুটিতে ঐ শ্রেণী সৃষ্ট ভয়ঙ্কর বাস্তবের মধ্যে— আর এই শ্রেণীর উদ্ভব আমাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে লন্ডন তথা ইংলন্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্রিয়ায়, ইংরেজি ভাষার সংলগ্নতায়। আজ যে এই শ্রেণী, দল কর্পোরেট জগৎ -মাফিয়া সরকারের সংযোগে তৈরি করেছে এক হিমশীতল শূন্য ভুবন। এই ভুবনকে বুঝতে ডিকেন্স আজও আমাদের সহায়ক।

বুর্জোয়া শিল্প বিপ্লব সাধারণ মানুষের জীবনে; শ্রমিকদের জীবনে কি যন্ত্রণা নিপীড়ন নিয়ে এসেছে, এটা শুধু ডিকেন্স দেখান নি। তিনি একটি শ্রেণীর ক্ষমতা লাভে, সমৃদ্ধির জাঁতাকলে এটা কেমন হলো, সেটা দেখিছেন। পুরনো জগৎ ভেঙে যাচ্ছে, এর জন্য তাঁর দীর্ঘশ্বাস ছিল না। বরঞ্চ নিরানন্দ শূন্যতার মধ্যেও তিনি একদিক থেকে মহৎ প্রত্যাশার কথা বলেছেন। মনে বৃদ্ধ হন নি, কিন্তু বাস্তব তাঁকে যে বিষণ্ণ করেছিল ক্রমশঃ তাতে সন্দেহ নেই। মার্কস কলোনির বিষাদের কথা বলেছিলেন আর ডিকেন্স

দেখিয়েনে কলোনিয়াল পাওয়ারের বিষাদ— এক নৈঃসঙ্গ নির্জনতার কথা। দারিদ্র মানুষের নিঃসঙ্গ মন— lonely, lonely তারা। আজও তাই।

প্রথম দিকে সামাজিক অশুভর কারণের অনুসন্ধান ডিকেন্স যত না করেছিলেন, তার অভিঘাতের কথা তার বেশি বলেছেন। ক্রমে তাঁর সময়ের পরিবর্তনের দিকে তাকান। আমরা আজ আমাদের বাস্তবে ঐ পরিবর্তনের মধ্যে। রেলওয়ে যুগে ডিকেন্স প্রযুক্তির এই পরিবর্তনের কথা হয়তো ভাবতেই পারতেন না, কিন্তু গত দেড়শো বছর ধরে এক পরিবর্তন ঐ সময়েই পরম্পরা—সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় এক নতুনরূপ ভিক্টোরিয়ান সমাজের শ্রেণী বিন্যাসের গল্প বলেন ডিকেন্স। দেখল সম্পদ, অর্থ স্টেটাস-এর প্রতীক হয়ে উঠছে, আর দুর্ভাগাদের ওপর অত্যাচারের অধিকারী এই অবস্থা নেই। ডিকেন্স বিপুল জনরিয়তা অর্জন করেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ হিসাবেই কিন্তু অর্থবল এই শ্রেণীর গচ্ছিত স্বার্থ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নঞর্থক ভূমিকাকে বুঝেছিলেন। আমাদের বাস্তবে আজ এই মধ্যশ্রেণী ঐ স্বার্থ ও ক্ষমতাকে কিভাবে ব্যবহার করছে, রক্ষা করার জন্য সবরকম দুর্নীতিকে অনুমোদন দিচ্ছে, তাকে আড়াল করার জন্য নীতিহীন কোন কাজেই তার আপত্তি নেই। আর এটা কোন বিশেষ ব্যক্তির কাজ নয়। আর এটাই সিস্টেম— এই সিস্টেমের সামনে মানুষ অসহায়। ডিকেন্স এটাই দেখিয়েছিলেন তাঁর সময়কার বাস্তবের চিত্রণে। তাঁর সময়কার উপযোগবাদে বা ক্রমজায়মান মার্কসীয় প্রস্থান তাঁর মধ্যে নেই— কিন্তু অভিজ্ঞতার ঔপন্যাসিক সংগঠনে তিনি পৌঁছলেন ঐ মার্কসীয় বীক্ষারই কাছাকাছি।

ডিকেন্সের সময় ধনতান্ত্রিক ‘সিস্টেম’ তাঁর বাস্তবে আধুনিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার শিল্পাশ্রয়ী বৈপ্লবিক রূপ ও তার আগ্রাসী অমানবিক মুনাফাতন্ত্রী বস্তু লুব্ধতা নিয়ে। এখন সেই রূপ পরিব্যাপ্ত আরও ভয়ঙ্করভাবে। ডিকেন্স তাঁর সময়ের ঐ রূপের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। আজ সে সমালোচনা আরও প্রাসঙ্গিক। বস্তুত, ডিকেন্সের উপন্যাসে যেন খুঁজে পাই বর্তমানের গল্প— এ তো কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলন্ডের গল্প নয়।

চার্লস ডিকেন্স দুই শহরের গল্প বলেছিলেন ১৯৫৯-এ। তার একদশকেরও বেশি আগে প্রকাশিত হয়েছে কমিউনিস্ট ইশতেহার। ডিকেন্স যে সভ্যতার সমৃদ্ধির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঐ সভ্যতার অন্তর্নিহিত অশুভ দিকের কথা বলেছিলেন, ঐ ইশতেহারে সেই সভ্যতার উত্তরণের ইঙ্গিতও ছিল। ডিকেন্স ঐ সভ্যতার নতুন মুখকে বুঝেছিলেন, তাঁর প্রবল আলোড়নকে আর এক বৈপ্লবিক অভিঘাত কোন অন্ধকারকে ডেকে আনছে তাকেই। তা একটা দ্বান্দ্বিক সময় আবার সব থেকে খারাপ। একই সঙ্গে মানুষের জীবন পরিপূর্ণ ও নিঃস্ব। সভ্যতার মুখকে এই একই সঙ্গে এক দ্বান্দ্বিক বীক্ষায় দেখা ডিকেন্সের জন্য বড় বৈশিষ্ট্য। ফরাসী বিপ্লব এই লন্ডনের অধিবাসীর কাছে কোন ট্র্যাজেডি ছিল না। একজন মানুষ বলেছেন, ডিকেন্স জানতেন “an Outbreak is seldom a tragedy, generally it is the outbreak of tragedy.” সব প্রকৃত ট্র্যাজেডিই নিঃসঙ্গ। বিপ্লবের উতরোল কণ্ঠ, তাঁর লাইয়ের চীৎকার একসঙ্গে জেগে ওঠা একটা ভ্রাতৃত্বের অপরিবর্তনীয় অঙ্গীকার মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সভাই করে শিভালরির সঙ্গে। ঐ আলোচক বলেন এই বইতে, যেমন ইতিহাসে গিলোটিন ক্যালামিটি নয়। বরঞ্চ ক্যালামিটির সমাধান। সিডনি কার্টনের পাপ বিপ্লবের নয়, অভ্যাসের— “His gloom is the gloom of London, not the gloom of Paris.” ডিকেন্স ফরাসী বিপ্লবকে বুঝতে চেয়েছিলেন লন্ডনবাসী হিসাবে। আর প্যারিস ও লন্ডনের দ্বৈত বীক্ষায়। এই বীক্ষাতেই তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন তাঁর সময় কেন শ্রেষ্ঠ, আবার কেন নিকৃষ্ট, কেন জীবন পূর্ণ ও নিঃস্ব। এখনকার বাস্তবে এই দৃষ্টিভঙ্গী বড় প্রয়োজন— এতেই আমরা ধরতে পারবো এ সময়ের ডায়ালেকটিকসে, সময়ের ওপরের ও ভেতরের তলের যুগপৎ ক্রিয়াকে।

আজও তো বাস্তবে একদিকে শ্রেষ্ঠ সময়। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশে যেন নতুন জগৎ— একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই দুঃস্থ বাঙালী বাস্তবেও ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও যা কল্পনার বাইরে ছিল, আজ তা প্রত্যক্ষ। সমাজের একটি স্তরে অভাবিত সব অভিঘাত। ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীর যেমন হয়েছিল, তখন রেলপথই তো ছিল বিস্ময়কর। উপনিবেশের ন্যায়ে আমাদের দেশে সেটি আসতে ত্রিশ বছর মাত্র সময় নিয়েছিল। এরকমই ছিল সাম্রাজ্য সচেতন বিশ্বায়ন। আজও তাই। অথচ দারিদ্র্য প্রকট, চাষীদের আত্মহত্যা দৈনন্দিন ঘটনা প্রায়, বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। এরকম ভারসাম্যহীনতা আগে আসে নি। শহর ও গ্রামের জীবন একদিকে যেমন মনে হয় কাছাকাছি অন্যদিকে কতদূর। সুযোগের দিক থেকে কত তফাৎ। সামাজিক বোধ হারিয়ে যাচ্ছে। সংযোগহীন এক জীবন। বস্তুলুব্ধতা, পণ্যমোহ তৈরি করছে এক লুণ্ঠক, মাফিয়া মন। প্রযুক্তি বা অন্য কিছুর পূর্ণতা নিঃস্ব করে দিচ্ছে আমাদের। হিংস্রতা ছাপিয়ে যাচ্ছে সমাজের পাত্র। এ দল সে দল, এ ব্যক্তি সে ব্যক্তি একটি সিস্টেম -এ প্রায় এক ভূমিকাই পালন করছে। অর্থনীতির অর্গল মুক্তির নামে এক নিয়ন্ত্রণহীন মুনাফা শিকারের সুখী ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এ সময়কেই তো ডিকেন্স পাঠ আমাদের চৈতন্যে ধাক্কা দিতে পারে। তাঁর সময়ের ইংলন্ডের অভিজাতদের মত কোন শ্রেণী কর্তৃত্ব এখানে না থাকলেও, তাদের স্মৃতিবাহীরাই এ বাস্তবের নিয়ন্ত্রক, সংসদীয় গণতন্ত্র তার কোন ব্যত্যয় কার্য ক্ষেত্রে করতে পারেনি— ডিকেন্সের ভাষায় এই নোবল রেফ্রিজারেটরদের কথা তো আমাদের মনে রাখতে হয়। চার্লস ডিকেন্সকে নতুন করে পড়া প্রয়োজন। হেনরী জেমস বা ভার্জিনিয়া উলফ-এর মত তাঁকে কেবল সেন্টিমান্টিলিটির লেখক হিসাবে দেখা ভুল— জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই লেখক তাঁর সময়কেও প্রভাবিত করেছিলেন— আজ কি কোন ঔপন্যাসিক সেভাবে করেন?